ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃশংসতা

শিক্ষার্থীনামে দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লউন

নাগরিক বৃক্ষের পাদদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ছাত্র রাহিদ খান পাভেলের এলাইয়া পড়া দেহ ও রক্তাক্ত মুখমণ্ডলের রবিবারের আলোকচিত্রটি ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের অসহনীয় দৃশ্যটি স্মরণ করাইয়া দেয়। জনৈক তরুণ ভাত খাইতেছেন; পরে ছাত্রাবাসের অতিথিকক্ষের মেঝেতে তাহার রক্তাক্ত দেহ। মানসিক প্রতিবন্ধী তোফাজ্জল হোসেনকে মোবাইল ফোন চুরির অভিযোগে পিটাইয়া হত্যার পূর্বে ভাত খাওয়াইয়াছিলেন ফজলুল হক মুসলিম হলের কতিপয় শিক্ষার্থী। খবর পাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল দল উপস্থিত হইয়াও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনিতে পারেন নাই। এইবার 'ছাত্রলীগ সন্দেহে' সাহ্‌রির সময় দফায় দফায় মারধর করিয়া থানায় সোপর্দ করা হইয়াছে পাভেলকে। ভিন্ন সময়ের হইলেও দৃশ্য দুইটি নৃশংসতায় অভিন্ন। ভুক্তভোগীর বিরুদ্ধে 'অভিযোগ' যাহাই থাকুক, দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শিক্ষার্থীরা এইরূপ নির্মম হইয়া উঠিবেন কেন? দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মব সৃষ্টি করিয়া ছাত্র-শিক্ষক লাঞ্ছনার যেই প্রবণতা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, এইরূপ নৃশংসতা উহারও সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। রবিবারের ঘটনাটি যে স্পষ্টতই ফৌজদারি অপরাধ– এই বিষয়ে সন্দেহ রাখা উচিত হইবে না।

নির্যাতনের শিকার পাভেলের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা লইয়া যেই অভিযোগ প্রহারকারীরা উত্থাপন করিয়াছেন, উহাও গ্রহণযোগ্য নহে। কেহ 'নিষিদ্ধ' ছাত্রলীগ করিলে এমনকি তাহার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অপরাধের অভিযোগ থাকিলেও উহার প্রতিকারের জন্য আইন-আদালত বিদ্যমান। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া কাহারও পোস্ট পছন্দ না হইলেও তাহাকে প্রহার করিবার অধিকার ক্ষমতার উচ্ছিষ্টভোগীদের জন্মায় না। ইহা সর্বার্থেই দুর্বৃত্তপনা। নির্যাতিত শিক্ষার্থীর মাতা সোমবার রাত্রে শাহবাগ থানায় দায়েরকৃত এজাহারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষার্থীর নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত কয়েকজনকে অভিযুক্ত করিয়াছেন। আমরা দেখিতে চাহিব অবিলম্বে অভিযুক্ত দুর্বৃত্তদের আটক করা হইয়াছে; আইন নিজস্ব গতিতে চলিবার ক্ষেত্রে তাহাদের রাজনৈতিক পরিচয় যেন প্রতিবন্ধক হইয়া না দাঁড়ায়।

অঘটনটিকে বিচ্ছিন্ন বলিয়া চিহ্নিত করিবার অবকাশ নাই। গণঅভ্যুত্থানের পরও ক্রমশ ছাত্রলীগ 'শাসনামল'-এর ন্যায় বলপ্রয়োগের সংস্কৃতি শিক্ষাঙ্গনে ফিরিয়া আসিতেছে বলিয়া যেই আশঙ্কা জন্ম লইয়াছে, তাহা অমূলক নহে। বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ অতীতে ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের

স্বৈরাচারাবরোধী আন্দোলন এবং সর্বশেষ জুলাই গণঅভ্যুত্থানে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করিয়াছে। কিন্তু তাহাদেরই একাংশ কেন আধিপত্য, প্রতিশোধ এবং ভয়ের সংস্কৃতি ফিরাইয়া আনিতে চাহিতেছে– উহা গভীর উদ্বেগের বিষয়। কোনো শিক্ষার্থীকে কেবল রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে যদি নির্যাতন করা হয়, তখন উহা নিছক সহিংস ঘটনা হইতে পারে না; বরং রাজনৈতিক সংস্কৃতির গভীর অবক্ষয়েরই লক্ষণ।

স্বীকার্য, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত দেশের অধিকাংশ শিক্ষাঙ্গনে আধিপত্য বিস্তার করিয়া ছিল ছাত্রলীগ। দেড় দশকের অধিক সময় ধরিয়া তাহাদের দাপটে অন্যান্য ছাত্র সংগঠন কার্যত কোণঠাসা অবস্থায় ছিল। আবাসিক হল হইতে অসংখ্য শিক্ষার্থীকে ছাত্রদল কিংবা ছাত্রশিবির আখ্যা দিয়া পিটাইয়া বহিষ্কার করা হইয়াছে। সেই ধারাবাহিক সহিংসতারই শিকার হইয়াছিলেন আবরার ফাহাদসহ অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী। বস্তুত ছাত্রলীগের এহেন কর্মকাণ্ডের ফলেই জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে শিক্ষার্থীদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে সংগঠনটি ক্যাম্পাসছাড়া হয়। হতাশাজনক, সেই সহিংসতার সংস্কৃতিই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসমূহে প্রত্যাবর্তন করিতেছে। এইখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন–আইনের শাসন কোথায়? বিচার করিবার দায়িত্ব আদালতের এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার। কিন্তু যখন শিক্ষার্থীরাই বিচারক ও দণ্ডদাতা হইয়া ওঠেন, তখন তাহা কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈতিক ভিত্তিকেই দুর্বল করিয়া তোলে না; আইনের শাসনকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে। এই ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনেরও সম্বিৎ ফেরা জরুরি। দল-মত নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করিয়া সহিংসতার বিরুদ্ধে দ্রুত, দৃশ্যমান ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে শিক্ষাঙ্গনে ভীতি ও অনিশ্চয়তার পরিবেশ গভীরতরই হইবে। আমরা প্রত্যাশা করিব, পাভেলকে নির্যাতনের ঘটনাটিই হইবে নৃশংসতার সর্বশেষ উদাহরণ।